68

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

'মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব ও সরকার' প্রসঙ্গে

এ এন রাশেদা

প্রাক্তন উপাচার্য, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী পূজনীয় ব্যক্তিত্ব। তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয় এইজন্য যে, আজকের এই ক্ষুদ্র লেখার তিনি সুযোগ করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশের শিক্ষকদের দুর্ভাগ্য বাড়াতে আরো কি আছে- কে বলতে পারে। অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তার লেখায় স্বীকার করেছেন, শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই, তাহলে অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে, কিংবা না জেনে অনুমাননির্ভর বক্তব্য প্রদান তার পক্ষে কতটুকু যৌক্তিকতার দাবি রাখে, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান তা বোঝার ক্ষমতা রাখে না।

যাহোক অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী কতগুলো বিষয় অর্থাৎ শিক্ষকদের দাবিসমূহ জানতে চেয়েছেন এবং পত্রিকার পাতায় এলে ভাল হয় বলেছেন। তাই সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। এই ধৃষ্টতার জন্য অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

আন্দোলনের পশ্চাতের কথা

১৯৯২ সালে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে নতুন পে- স্কেল বাস্তবায়ন করেছিল। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারিগণ বেতনের ৭০% শতাংশ বেতনের অংশ নয়, 'অনুদান' হিসেবে পেয়ে আসছিলেন; জাতির বিবেক শিক্ষক সমাজ যারা এদেশের কর্ণধার তৈরি করে, তারাই তাদের শিক্ষকদের ভিক্ষে দেয়ার দৃষ্টতা পোষণ করে- জাতির এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে। শিক্ষকরা তাই নিজেরাই এই 'অনুদান' শব্দ বাতিলের দাবি করেছে। '৯২ সালের নতুন পে-স্কেলের ঘোষণা বেসরকারী শিক্ষকদের বেলায় কার্যকরী করতে সরকার রাজি ছিল না- কারণ তা ঐ ভিক্ষে বলে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি যদি সরকারের পূর্ণ বেতনভোগীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে তাহলে বেতনের ৭০% শতাংশ ভোগকারীদের গায়ে তা আঁচড় কাটবে না- এমন অমানবিক আচরণ তো শিক্ষক সমাজ আশা করে না। শিক্ষকদের তাই নিরুপায় হয়ে ৩৩ দিন ধর্মঘট করতে হয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটী শিক্ষকদের সংগ্রাম পিরাজো কমিটিকে সুগন্ধায় নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নতুন পে-স্কেলদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও এক বছর পর থেকে, বাকি দাবি নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে শিক্ষা সচিব শফিকুল আলমকে সভাপতি করে অর্থ [illegible] রিপোর্ট প্রদান করতে বলেছিলেন। মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতার কারণে তা ২০ [illegible] যোগাযোগের বহু চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কোনভাবেই তা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৩ প্রধানমন্ত্রীকে ২ সপ্তাহের সময় দিয়ে চূড়ান্ত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তার কোন জবাব আজও মেলেনি। তাই শিক্ষকদের বাধ্য হয়ে ক্লাস ছেড়ে আবার পথে নামতে হয়েছে।

অন্যান্য দাবি

অনেক দাবি মানা হয়েছে বলে সরকার যে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং বিদগ্ধজনদের কেউ কেউ বিচলিত বোধ করছেন- তা আদৌ সঠিক নয়। শিক্ষকরা স্কেলের প্রারম্ভিকের শুধু ৭০% পেয়ে থাকেন কিন্তু তার কোন নড়ন-চড়ন নেই। তাই প্রতিবছর ইনক্রিমেন্টের দাবিও যুক্ত ছিল ১ নং দাবির সঙ্গে। কিন্তু ১নং দাবিরও সবটুকু মানা হয়নি। পরবর্তী দাবি ছিল ভবিষ্যতে বেতন স্কেল সংশোধিত হলে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদেরও যাতে স্বয়ংক্রিয়-ভাবেই হয় এবং প্রতিমাসে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেন ব্যাংক অর্থ বিল সম্পন্ন করতে পারে। এর অর্থ হলো শিক্ষকরা প্রতিমাসে তাও পেতেন না। শিক্ষকদের প্রতি যে এই অবজ্ঞা- বিবেকবানরা একে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? বিদগ্ধজন এবং দেশবাসীর অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষকদের বাসাভাড়া মাসিক ১০০ টাকা এবং এ ব্যাপারে বাড়তি টাকা প্রতিষ্ঠানও দিতে পারবে না- এই মর্মে মুচলেকার পর শিক্ষকদের ১০০ টাকা প্রদান করা হয়। সরকার-বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের প্রমোশনের পথও বন্ধ করে রেখেছেন। স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের টাইম স্কেলও বন্ধ করেছেন- শিক্ষকতা পেশাকে আরো দক্ষ করে গড়ে তোলায় এসব বাধা কখনই সুফল বয়ে আনে না। তাই শিক্ষকদের পদোন্নতির দাবিকেও তো অযৌক্তিক বলা যায় না। শিক্ষকদের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে ম্যানেজিং কমিটির প্যাটার্ন সামান্য বদল, পন্ডিতদের বেতনস্কেল ও কর্মচারীদের ইনডেক্স নম্বর প্রদান, ৬০ ঊর্ধ্বে কর্মরত শিক্ষকদের সরকারী বেতনসহ ৬৫ বছর পর্যন্ত প্রদান, ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সার্ভে ও ভুয়া শিক্ষক-কর্মচারী সনাক্তকরণ, সীমাহীন দুর্নীতির উৎস অপ্রয়োজনীয় পরিদর্শন শিক্ষা অধিদপ্তর বিলোপ করে পূর্বের মত অডিট ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি। এছাড়াও আছে আরো ৪টি দাবি যাকে শিক্ষক সমাজ গুরুত্ব দিয়ে সামনে এনেছেন, ফলে দাবি কমে গেছে বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। এসবের মধ্যে আছে শিক্ষা জাতীয়করণের লক্ষ্যে সরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুরূপ ভাতাদিসহ পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতন স্কেলের দাবি। এই দাবি ১৫ দফায় ৯৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ছিল- সময়ের ব্যবধানে তা সামনে চলে এসেছে।। এর কারণও আছে- সরকার ৭৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থানা ভিত্তিতে 'জাতীয়করণ' বললেও প্রকৃত অর্থে সরকারীকরণ করতে চেয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় পাকিস্তান আমল থেকে কারমাইকেল কলেজ, বিএল কলেজ, বি এম কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ- প্রভৃতিকে যে Provincialisation করা হয়েছিল তার পরিণতি ভাল হয়নি। এখনও সেই ধারায় 'জাতীয়করণ' বলে সরকারীকরণ করা হচ্ছে- ফলে নানা কারণে শিক্ষা ধ্বংস হচ্ছে; তাই শিক্ষকসমাজ এই প্রক্রিয়া বন্ধ করে প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা রেখে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা চাইছে। পশ্চিমবঙ্গে ও সারা ভারতে সরকারী ও বেসরকারীদের মাঝে ১৯৭৮ সাল থেকে সমতার এই নীতি চালু হয়েছে। বেসরকারী শিক্ষকরা এখন পেনশনের সুবিধাও ভোগ করতে চলেছেন। এর ফলে মেধাবীরা এখন শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নিতে অধিক আগ্রহী হয়েছেন। যারা সমাজের উচ্চ আসনে বসে শিক্ষকদের বিবেক নিয়ে কটাক্ষ করেন তারা কিন্তু নিজেরা ঐ স্তরের এই পেশাকে মেধাবী হয়েও বেছে নেননি- সমাজে সম্মান নেই বলে। উচ্চাসনে বসে উঁচু উঁচু [illegible] হিসেবে দেখা যায় বর্তমানের বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষা খাতের ৩৩০ কোটি টাকার বাজেটকে ৪৭২ কোটি টাকায় উন্নীত করলে প্রারম্ভিক স্কেলের ১০০% দেয়া সম্ভব। এতে বাড়তি প্রয়োজন হবে ১৪২ কোটি টাকা অথচ এটাকে শিক্ষামন্ত্রী ৩ হাজার কোটি টাকা বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। যা দেখে সমাজের উচ্চাসনে বসা ব্যক্তিবর্গ বিচলিত বোধ করছেন. আর সরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুরূপ সকল বেতনভাতা- পেনশন ইত্যাদি দিতে হলে বছরে প্রয়োজন হবে ১২৫০ কোটি টাকা। তাতে বর্তমান বরাদ্দ থেকে ৯২০ কোটি টাকা বেশি প্রয়োজন হতে পারে। চার দফা দাবির ২ নং দাবিতে আছে কল্যাণ ট্রাস্ট পুনর্গঠনের। যে দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পরও শিক্ষামন্ত্রী তাদের অনুগত শিক্ষক সংগঠন দিয়ে তৈরি করেছেন।

(আশ্চর্যের বিষয় হলো যারা এই দাবি তোলেওনি আন্দোলনও করেনি) সেই দাবি প্রাধান্য পেয়েছে ৪ দফার তিন দফা ও ১৫ দফার অন্তর্ভুক্ত যা আইএলও এবং ইউনেস্কোর সুপারিশমালা বাস্তবায়নের দাবিতে আছে। এবং ৪ নং-এ আছে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সুযোগের সমতা বিধান।

১৫ দফা দাবির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হল- শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের ৭% ব্যয়বরাদ্দ ধার্য করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। ডঃ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪ সালেই চিন্তা করা হয়েছিল ''আমাদের শিক্ষা খাতে ব্যয় অবিলম্বে মোট জাতীয় আয়ের ৫%-এ উন্নীত করা দরকার এবং এ ব্যয়ের পরিমাণ যত অল্প সময়ে সম্ভব ৭% করা জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে সার্ক দেশভুক্ত দেশগুলো জাতীয় আয়ের কত শতাংশ ব্যয় করে সে দিকে লক্ষ্য করা যাক। বাংলাদেশ ২.২%, ভুটান ৪.৮%, ভারত ৩.২%, নেপাল ২.৯%, পাকিস্তান ৩.৪% এবং শ্রীলংকা ২.৭%। কাজেই ডঃ কুদরত-ই- খুদা কমিশন রিপোর্টের মূল সুর অনেক গভীরে ও শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে সুদূরপ্রসারী ছিল. রিপোর্টে পাশাপাশি অনেক প্রস্তাবনার মাঝে থেকে ১টি প্রস্তাবনাকে তুলে ধরে তাকে খন্ডিত করার লেখকের প্রচেষ্টা মঙ্গলজনক নয় বলেই মনে হয়। লেখককে সবিনয়ে জানাতে চাই গ্রামের স্কুলের বেতন সরকারী নির্দেশে ২৫ টাকার বেশি নয় এবং মেয়েদেরও নেই সেখানে ছাত্রপ্রতি এই বেতন নিয়ে ৫০% শিক্ষার খরচ এবং শিক্ষকদের বেতনভাতা দেবেন কিভাবে? শুধু ঢাকা শহরের দু'একটি উদাহরণ হতে পারে না। ইংরেজি জানলে জ্ঞানী হওয়া যায় না অংকের ন্যূনতম জ্ঞানও যে প্রয়োজন।

.১৫ দফায় আরো কিছু দাবি আছে যা যখন-তখন শিক্ষা নিয়ে ভোগলকী কারবারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবি।

আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মাঝে কোন অযৌক্তিক প্রত্যাশার জন্ম দেয়নি. বর্তমানে জাতীয় আয়ের মাত্র ২% বাড়ালেও তা কিছুটা সম্ভব- যাতে উপকৃত হবে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ। পরিবহন, শিল্প ও শিক্ষার যে অচলাবস্থা সৃষ্টির সংস্কৃতি চালু হয়েছে বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। তার কারণ এ খাতগুলো [illegible] বলে। যে খাত অবহেলিত নয় সেখানে অচলাবস্থা হবে কেন? তবে লেখক চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেননি- সে খাতটিও- অবহেলিত এবং সেখানে প্রায় অচলাবস্থা। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণকর সকল খাতই এই সরকারের কাছে অবহেলিত। অর্থ কোথা থেকে আসবে?- এই প্রশ্নের জবাব পেতে বিবেকবান মানুষদের অসুবিধা হবার কথা তো নয়। পত্রিকার খবর অনুযায়ী বিদেশে আমলা প্রশিক্ষণের জন্য ৫০০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে- বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ট্রেনিং দেয়া হবে হল্যান্ড, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায়। এখানে অর্থের অভাব হয় না- অভাব শুধু শিক্ষকদের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার দাবি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক করার ক্ষেত্রে।